হাওরে দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি

লিখেছেন **শেখ রোকন**

সুনামগঞ্জে অকাল বন্যায় ডুবে গেছে হাওরের সমস্ত ফসল। শিলাবৃষ্টিতে অপেক্ষাকৃত উঁচু অঞ্চলের ধান নষ্ট হয়ে দুর্যোগের ষোলকলা পূর্ণ হয়েছে। এই এলাকায় সারা বছরে একটি ফসলই হয়। জেলা প্রশাসনের হিসাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আড়াই লাখ পরিবার আর ৪৫০ কোটি টাকার সম্পদ। গত ৩০ বছরে হাওরের মানুষ এমন আকাল দেখেনি। চারদিকে দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি।

'এই নদীর নাম কি?' সুনামগঞ্জ শহর। হাসনরাজার বাড়ির পাশে সুরমা নদীর পাড় হয়ে আমরা যাচ্ছি উত্তর-পূর্ব দিকে। সামনে আকাশের গায়ে অনেক উঁচু পর্যন্ত হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে খাসিয়া-জৈন্তা পাহাড়। সুরমা থেকে ছোট্ট পাহাড়ি নদীটির স্বচ্ছ পানিতে খাসিয়া-জৈন্তার ছড়া মাড়িয়ে উজানে এগুচ্ছে আমাদের শ্যালো বোট। সামনের গলুইতে লগি হাতে দাঁড়ানো মর্তুজ আলী আমার প্রশ্নের উত্তর দেয়- 'নাম তো চলতিয়ই।' সারা বছর নাব্য থাকে বলে নদীর এই নাম। বাঁ দিকে মোড় নিয়ে বাঁধের ভাঙা অংশ দিয়ে আরেকটি নদীতে ঢোকে আমাদের নৌকা। গন্তব্য বিশ্বম্ভরপুর থানার করচার হাওর। স্বল্প পানিতে নদীর তলা দেখা যাচ্ছে। এই নদীটির নাম নিয়েও আমার কৌতূহলের জবাবে মর্তুজ আলী খানিকটা বিরক্ত হয়েই বলে, 'খইতাম পারি না।'

মর্তুজ আলীর মাঝি হওয়া

হাওর আর বিল-নদীর দেশ সুনামগঞ্জ। সরকারি ভাষায়- ২০ একরের উর্ধ্ব পরিসীমার বদ্ধ জলাশয় ৪২৫টি, অনূর্ধ্ব-২০ একর ৫৭৯টি। জেলাজুড়ে উন্মুক্ত জলাশয়ের সংখ্যা ৭৩টি। এর মধ্যে রয়েছে সুরমা-কালনী ছাড়াও ছোটবড় ২৫টি নদী। টাঙ্গুয়া, করচা ও শনির হাওরের মতো ২৮টি বড় হাওর। এই বিপুলসংখ্যক নদী-হাওর-বিলের নাম মনে রাখা কঠিন হলেও রোদে পোড়া চেহারার অভিজ্ঞ মর্তুজ আলীর তা মুখস্থ থাকার কথা। কিন্তু সুনামগঞ্জ সদরের ভাতেরটেক গ্রামের মর্তুজ আলীর জলাশয়-জ্ঞান সামান্যই।

প্রতি মৌসুমে ২০০ মণ ধান পাওয়া সম্পন্ন কৃষক মর্তুজ আলী মাঝি সেজেছেন এক মাসও হয়নি। কয়েক হাজার টাকা দাদন নিয়ে ১০ কিয়ার (১ কিয়ার =৩০ ডেসিমিল) জমিতে ধান লাগিয়ে দুই ছেলে আর স্ত্রীসহ দিনরাত পরিশ্রম করেছেন। এক রাতের বন্যায় হারিয়ে গেছে পরিবারটির সারা বছরের খোরাক। অনেকগুলো স্বপ্ন। প্রতি বছর এ সময়টা মর্তুজ আলীদের কাটে গোলায় ধান তোলার ব্যস্ততায়। এবার মর্তুজ আলী তার নিজের জবানিতে বলেন, 'এক মুডোও তুলতাম পারি নাই। বেকটি পইচ্চা গোবুর অইছে।'

মর্তুজ আলী একা নয়

সিলেট-সুনামগঞ্জ সড়কের সুনামগঞ্জ অঞ্চলে ঢোকার পরপরই রাস্তার দু'পাশে পানির নিচ থেকে তোলা পচা ধানের স্তূপ চোখে পড়ে। জেলা জজকোর্টে মামলার কাজে এসেছিলেন ছাতকের ধারণ নতুন বাজার হাই স্কুলের সাবেক শিক্ষক গাজী সুলতান মাহমুদ (৬৫), জমি বিক্রি করার জন্য রেজিস্ট্রি অফিসে এসেছিলেন সদর থানার বীরগাঁওয়ের নুরুল হক (৬০), 'হাওরবাসী রক্ষায় নাগরিক উদ্যোগ'-এর মানববন্ধনে অংশ নিতে জেলা পরিষদ চত্বরে এসেছিলেন দিরাই থানার করিমপুরের হামিদ মিয়া (৪৫) আর মোর্শেদ আকমল (৫০)। তারা সবাই মর্তুজ আলীর মতো সর্বস্ব খুইয়েছেন বানের পানিতে।

বিশ্বম্ভরপুর বাজারের চায়ের দোকানে কথা হলো গন্দামারা গ্রামের ফজর আলীর (৫০) সঙ্গে। তার এলাকা খানিকটা উঁচু। ধানের ক্ষেত পানির নাগালের মধ্যে নয়। এ জন্য নিশ্চিন্ত মনেই খানিকটা দেরি করে ধান লাগায় গন্দামারা এলাকার লোকজন। কিন্তু এবার আঘাত হেনেছে শিলাবৃষ্টি। তিন দফা আক্রমণে এলাকার সমস্ত ধানক্ষেত নষ্ট হয়েছে। তিনি বাজারে এসেছিলেন ভাড়া নৌকার খোঁজে। শনির হাওরে পচা ধান তুলতে যাবেন। বিশ্বম্ভরপুরে সুনামগঞ্জ জেলা পরিষদ বিশ্রামাগার 'কিছুক্ষণ'-এর সামনে রিকশা নিয়ে দাঁড়ানো কাটাখালী এলাকার ফুল মিয়া (৪৭)। হাতে রিকশার হাতল ধরা থাকলেও মাথার মাথালটি তার কৃষি কাজের স্মারক। জানা গেল প্রতি বছরের মতো এবারও ৩ কিয়ার জমিতে তরমুজ লাগিয়েছিলেন। শিলাবৃষ্টিতে নষ্ট হয়ে গেছে সব।

ডুবে যায় মুঠোর স্বপ্ন

বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান শস্য ভান্ডার সুনামগঞ্জের হাওর অঞ্চল। গোটা জেলার ২ লাখ ৪ হাজার ৬২৪ হেক্টর ফসলি জমিতে উৎপন্ন ধান জেলার প্রয়োজন মিটিয়ে দেশের অন্যান্য অঞ্চলে সরবরাহ করা হয়। ধান কাটার মৌসুমে সারা দেশ থেকে বিপুলসংখ্যক মজুর এই এলাকায় কাজ করতে আসে।

এবার এপ্রিলের ১৫ তারিখ থেকে প্রবল বর্ষণ আর পাহাড়ি ঢলে বাঁধ ভেঙে একের পর এক তলিয়ে যেতে থাকে হাওরের ধানী জমি। ২৮টি বড় হাওরের মধ্যে ২৬টি সম্পূর্ণ তলিয়ে যায়। অন্য দুটিও মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিশ্বম্ভরপুর থানার ফুলবুড়ি গ্রামের আঃ রহিম এবারের বন্যা সম্পর্কে বলছিলেন, 'অইন্য বছছর পানি আহে দিরং কইরা- বৈশাহের ৮/১০ তারিহে। এবারে এক্কেরে চৈতে আইছে। আমরা কুলাইতাম পারতাম না।'

বন্যায় হাওরের ধানগুলো ডুবে যাবার পরপরই সুনামগঞ্জ জেলা প্রশাসক একটি সংবাদ সম্মেলন ডাকেন। তিনি বলেন, 'সুনামগঞ্জের ৭০ হাজার হেক্টর জমির কাঁচা-পাকা ফসল পানির নিচে তলিয়ে গেছে এবং প্রায় ৩০০ কোটি টাকার ফসল নিমজ্জিত হয়েছে। জেলার ২৮টি হাওরের মধ্যে ২২টি হাওরের বোরো ফসল ইতিমধ্যে

তলিয়ে গেছে। বাকি ৬টি যেকোনো সময় তলিয়ে যেতে পারে।'

জেলা প্রশাসন থেকে অকাল বন্যায় ক্ষয়ক্ষতির সর্বশেষ পরিসংখ্যানে বলা হয়েছে, জেলার ১০টি উপজেলার সবকটিই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত ইউনিয়নের সংখ্যা ৮৪টি, ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা ১০০৪ বর্গ কি. মি. ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সংখ্যা ২ লাখ ৫০ হাজার, ক্ষতিগ্রস্ত লোকের সংখ্যা প্রায় ১৭ লাখ। বন্যায় ডুবে যাওয়া ফসলের দাম ৪৫০ কোটি ৮৫ লাখ টাকা।

হাওর অঞ্চল জুড়ে হাহাকার

বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ (এপ্রিল-মে) মাসটি হাওর এলাকার আনন্দের সময়। কৃষকের গোলাভরা ধান থাকে। অ-কৃষকও তার অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ায় প্রভাবিত হয়। জলে টইটম্বুর হাওর এলাকার বিয়ে-উৎসব-পার্বণ, যাত্রাপালা অনুষ্ঠান এই সময়টাতে সম্পন্ন হয়ে থাকে।

সুনামগঞ্জের কয়েকটি হাওর এলাকার জনপদ ঘুরে দেখা গেছে, কোথাও কোনো আনন্দের চিহ্ন নেই। নৌকা নিয়ে হাওরে গিয়ে আঁচড়া নিয়ে ডুব দিয়ে দিয়ে সামান্য কিছু ধান উদ্ধার করতে পেরেছে কিছু লোক। এগুলোর অধিকাংশই খাবার অনুপযোগী। অর্ধাহারে-অনাহারে দিন কাটছে অধিকাংশ হাওরবাসীর। বিগত ৩০ বছরে এই এলাকায় এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়নি। করচার হাওর পাড়ের বিশ্বম্ভরপুর গ্রামের খরম আলী (৪০) গামছা পরে ঘরের দাওয়ায় বসে ছিলেন। এবারের পরিস্থিতি সম্পর্কে বললেন, 'এই বছছরে এক্কেরে ডাকাতি করছে হাওর। কিচ্ছু রাখে নাই। এবার আল্লায় আমার জন্য কি রাখছে হেই জানে।'

জেলার হাহাকারের চিত্র ফুটে উঠেছে স্থানীয় সংবাদপত্র সাপ্তাহিক সুনামকণ্ঠের একটি রিপোর্টে। পত্রিকাটির ২০ এপ্রিল সংখ্যায় লেখা হয়- 'মহাদুর্যোগের কবলে সুনামগঞ্জ। জেলার সর্বত্র ধ্বংসযজ্ঞের বীভৎস চিত্র। সব দিক থেকে দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি। একই সঙ্গে টর্নেডো ও অকাল বন্যার আঘাতে এখন সুনামগঞ্জ এক বিধ্বস্ত জনপদ। হাওর পাড়ে ফসল হারানো কৃষকের মাতম। বিরূপ প্রকৃতি কৃষকের বুকভরা আশা গুঁড়িয়ে দিয়েছে। হাওরের দোল খেলানো সোনালি ধানের শীষ হারিয়ে গেছে অথৈ জলে। মাত্র ক'দিন আগের শস্য শ্যামল হাওরে শুরু হয়েছে তরঙ্গের গর্জন। দু'সপ্তাহ আগেও ছিল যাদের বুকভরা আশা ও সোনালি ফসল তোলার আনন্দোল্লাস, এখন তারা নির্বাক হতাশার কাফন জড়ানো জীবন্ত লাশ।'

কৃষির জন্য বড় আঘাত

দেশের অন্যান্য কৃষি অঞ্চলের সঙ্গে সুনামগঞ্জের বড় পার্থক্য হচ্ছে এখানকার প্রায় সবগুলো জমি এক ফসলি এবং দেশীয় প্রজাতির ফসল অধ্যুষিত। প্রায় সারা বছর হাওরগুলোতে কমবেশি পানি থাকায় শুকনো মৌসুমের তিন-চার মাস মূলত ধান চাষাবাদ করা সম্ভব হয়। এখানকার মাটি ও প্রকৃতির চরিত্র অনুযায়ী হাইব্রিড ধান চাষ করা সম্ভব হয় না। গোটা এলাকাতেই স্থানীয় জাতের রাতা, গুছি, মালা, ঢেপী প্রভৃতি প্রজাতির ধান উৎপন্ন হয়। কৃষকেরা এই ধানগুলো থেকেই পরবর্তী বছরের বীজ রেখে দেন।

এবারের দুর্যোগে গোটা হাওরাঞ্চলের ধান নষ্ট হওয়ায় বীজ রাখা সম্ভব হয়নি। অন্যান্য বছর দুই-চারটি হাওর কিংবা ভাঙার দিকের জমিগুলো অক্ষত থাকায় চড়া মূল্যে হলেও বীজ সংগ্রহ করা যায়। এবার কোনো আশাই নেই। হাইল্যার হাওর এলাকার আব্বাস আলী (৬০) বলছিলেন, এবার আর গেরস্থের পুত্র গেরস্থ থাকতো না। উন্নয়ন সংস্থা একশন এইডের সুনামগঞ্জ প্রকল্প ব্যবস্থাপক মোসাব্বের হোসেন বললেন, দুর্গত মানুষদের টিকে থাকার জন্য খাদ্য সাহায্যের পাশাপাশি কৃষি সহায়তাও সমান জরুরি। আগামী মৌসুমের আগে চাষের জন্য ধানবীজ না পেলে এই কৃষকের অনেকটা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

কৃষকের নিজেদের খাদ্যভাবের পাশাপাশি দেখা দিয়েছে তীব্র গো-খাদ্য সংকট। ধানমাড়াই শেষে পাওয়া খড়ে গরুর সারা বছরের খাদ্যের সংস্থান হয়। করচার হাওর এলাকার কৃষক আব্দুল হকের (৬৫) চারটি গরু। এগুলো তার চাষাবাদের মূল পুঁজি। অন্যের কাছ থেকে চেয়ে আনা পঁচা খড় গরুর সামনে দিয়েছেন। আক্ষেপ করে বললেন, 'নিজয়ই তো ভাত পাইল, গরুর আহার কোন থাইক মিলামু।' ক্ষুধার যন্ত্রণায় গুরুগুলো পঁচা খড় গিললেও আব্দুল হকের আশঙ্কা এগুলো রোগাক্রান্ত হয়ে পড়তে পারে।

কেউ ভালো নেই

সুনামগঞ্জ এলাকার চাল মাপার পদ্ধতিটা অভিনব। সনাতন শের-ছটাক কিংবা মেট্রিক পদ্ধতির কেজি-গ্রাম কোনোটাই এখানে চলে না। চাল মাপার জন্য এখানে ব্যবহৃত হয় বাঁশের তৈরি 'খুচি'। এক খুচি প্রায় ২৩০০ গ্রাম। শহর এলাকার কোনো কোনো জায়গায় বাঁশের খুচির বদলে কনডেন্সড মিল্কের খালি কৌটা এসেছে। কিন্তু হিসাবটা খুচিতেই ৮ কৌটায় এক খুচি।

সুনামগঞ্জ শহরের নতুন বাজারে চাল কিনতে এসেছেন বাঁধনপাড়ার জমালউদ্দিন। পেশায় রিকশাচালক (সুনামগঞ্জে বলা হয় ডাইবর)। জামালউদ্দিনের ৮ জনের পরিবারে প্রতিদিন ২ খুচি চালের প্রয়োজন হয়। দুর্যোগের ফলে একদিকে উপার্জন কমে গেছে, অন্যদিকে বেড়ে গেছে চালাসহ জিনিসপত্রের দাম। এক খুচি চালে পুরো পরিবার চলতে হচ্ছে।

চালের দোকানদার সোহেল (২৫) জানালেন, ফসল তোলার মৌসুমে আগেন্টরাতা চালের খুচি ছিল ২০ টাকা। এবার সেটা দাঁড়িয়েছে ৩২ টাকায়। ২০-২১ টাকার টেপী, গুছি চালের দাম ৩৫ টাকা খুচি। ১৭-১৮ টাকার মালা ধানের চাল বিক্রি হচ্ছে ২৬ টাকায়। কেবল চালের দামই বেশি নয়, চালের গুণগত মানও যথেষ্ট খারাপ। দশ বছরের দোকানদারি অভিজ্ঞতায় সোহেল এমন পরিস্থিতি দেখেননি।

১৩ বছর ধরে ডিএফ রোডে চায়ের দোকান করেন ক্ষীতেস দেব। রিকশাচালক জামালউদ্দিনের মতো তারও কৃষির সঙ্গে সরাসরি কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু কৃষিতে বিপর্যয়ের প্রভাব পড়েছে সামগ্রিক আর্থ-সামগ্রিক ব্যবস্থায়। আগের দিনে দুই-আড়াইশ টাকা বিক্রি হতো। এখন সেটা নেমে এসেছে ৩০-৪০-এর কোটায়। বিক্রি-বাট্টা কমে গেছে শহরের অন্যান্য ব্যবসাকেন্দ্রগুলোতে। সাপ্তাহিক সুনামকণ্ঠের সম্পাদক বিজন সেন রায় বললেন, অকাল-বন্যা ও শিলাবৃষ্টি সুনামগঞ্জের জন্য বিরাট দুর্যোগ। কেবল কৃষক নয়, সবাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। প্রশাসনের পক্ষে যে পরিমাণ ত্রাণ এসেছে তা অপ্রতুল। এখনই পর্যাপ্ত সহায়তা না দেয়া হলে অনেক কৃষক জমি, ভিটে-মাটি ও গুরু বিক্রি করে নিঃস্ব হবেন।

দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ করতে হবে

পানির নিচ থেকে পচা ধান তুলে কিংবা ধার-বন্ধকের সাহায্যে হাওরাঞ্চলের মানুষ এখনো আধপেটা খেয়ে অর্ধাহারে চলছে। কিন্তু সামনের আরেকটি ফসল না ওঠা পর্যন্ত আরো ভয়াবহ দিন অপেক্ষা করছে তাদের জন্য।

ভোলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রথম দিকেও এ অবস্থাকে মারাত্মক ফসলহানি ও মহাদুর্যোগ ঘোষণা করে সহায়তা চাওয়া হয়েছে। বন্যা ও শিলাবৃষ্টির পরপরই কয়েক দফায় সুনামগঞ্জ পরিদর্শন করে গেছেন পানিসম্পদমন্ত্রী মেজর (অবঃ) হাফিজউদ্দিন আহমদ বীর বিক্রম, দুর্যোগ ও ত্রাণ বিষয়ক উপমন্ত্রী আসাদুল হাবীব দুলু, কৃষি প্রতিমন্ত্রী মীর্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরসহ সরকারের উচ্চ পর্যায়ের অনেক প্রতিনিধি। খাদ্য সাহায্য, গবাদিপশু কেনার টাকা, বীজ সরবরাহ, কৃষি ঋণ, হাওরের বাঁধ রক্ষা, নদী ড্রেজিং নানা প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেছেন তারা। দিনের পর দিন পরিস্থিতির অবনতি হচ্ছে, কিন্তু প্রতিশ্রুতি পূরণের কোনো সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না।

হাওরাঞ্চলজুড়ে দুর্ভিক্ষের ঘনঘটায় কৃষক, শিক্ষক, রাজনীতিক, আইনজীবীদের নিয়ে গর্বিত হয়েছে 'হাওরবাসী রক্ষায় নাগরিক উদ্যোগ' নামে একটি কোরাম। ২০ মে এই কোরাম সুনামগঞ্জ শহরে মানববন্ধন ও সংবাদ সম্মেলন করেছে। ২৩ তারিখে বিভাগীয় শহর সিলেটে একটি, ২৯ মে ঢাকায় আরো দুটি সংবাদ সম্মেলন করেছেন তারা। নাগরিক উদ্যোগের দাবি, আগামী সফল না ওঠা পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের জন্য ভিজিডি ও কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি চালু করতে হবে। নমনীয় শর্তে কৃষি ঋণ ও বয়স্কভাতা প্রদান এবং বকেয়া ঋণ মওকুফের দাবিও জানিয়েছেন তারা। নাগরিক উদ্যোগের অন্যতম সদস্য সুনামগঞ্জের প্রবীণ রাজনীতিক অ্যাডভোকেট আলী ইউনুস বললেন, সাময়িক এসব ব্যবস্থার পাশাপাশি অকাল বন্যা থেকে হাওরাঞ্চলকে বাঁচানোর জন্য নদী ড্রেজিং, পরিকল্পিত বাঁধ ও স্লুইস গেট নির্মাণ করা জরুরি।